সুনির্ম্মল বসু

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

অগাষ্ট
১৯৬১

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

● সুনির্ম্মল বসুর ●
কয়েকখানি বই

১। ছোটদের পদ্মাপুরাণ
২। মরণের ডাক
৩। পাত্‌তাড়ি
৪। হুলস্থুল
৫। হৈ চৈ ১ম ও ২য়
৬। প্রাচীনকথা
৭। কেউটের ছোবল

উপহার

সূচীপত্র

সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত	...	...	৫
অজানা কুটুম	...	...	১৫
গোবিন্দ-দার গোয়েন্দাগিরি	...	...	২৮
কাব্যরোগের টোট্‌কা	...	...	৩৭
জন্মদিন	...	...	৪৯
ফাঁকি	...	...	৬৩
ভিখারিণীর ছেলে	...	...	৭১
চোখের জল	...	...	৮০

সত্যব্রতের একটা প্রধান গুণ ছিল সে কখনো সত্য কথা বল্‌ত না। নাম তার সত্যব্রত হলেও মিথ্যাকেই সে যেন জীবনের ব্রত করেছিল!

এমন অনায়াসে স্বচ্ছন্দে, অনর্গল মিথ্যা কথা বল্‌তে কেউ পারে কি না সন্দেহ। অনর্গল চাল মারাই ছিল তার স্বভাব। ধরা পড়ে' যেত সে কথায় কথায়, তবু ঘাবড়াতো না একরত্তিও।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যত বড় বড় লোক, সবাই সত্যব্রতের আত্মীয়। সত্যব্রত বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড় ছিল। আমরা স্কুলে এক ক্লাশেই পড়তাম।

আমাদের বাংলার মাষ্টার হেমাঙ্গ বাবু ছিলেন একটু কবি প্রকৃতির। কবিতা পড়্তে আর পড়াতে তিনি খুব ভালো-বাসতেন।

একদিন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কবিতা লিখ্তে পার?"

সত্যব্রত ধাঁ করে' উঠে বল্লে, "স্যার, আমার জ্যাঠামশাই পারেন।"

হেমাঙ্গ বাবু বল্লেন, "তোমাদের কথাই জিজ্ঞাসা করছি; খুড়ো-জ্যাঠামশাইয়ের কথা আমি তুলছি না। তোমরা কে পার —তাই বল।"

আমরা সবাই চুপ করে' রইলাম; কারণ, বাস্তবিকই কবিতা আমাদের মধ্যে কেউ-ই লিখ্তে পারত না।

হেমাঙ্গ বাবু তখন সত্যব্রতকে বল্লেন—"তোমার জ্যাঠামশাই বুঝি কবিতা-টবিতা লিখ্তে পারেন? কাগজ-পত্রে ছাপান্ কি?"

সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত

সত্যব্রত হেমাঙ্গ বাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ স্যার, তাঁর বিস্তর কবিতা কাগজ-পত্রে বের হয়; তাঁর অনেক বইও আছে।"

হেমাঙ্গ বাবু বল্লেন, "বটে! কি তাঁর নাম?"

সত্যব্রত বুক্ টান্ করে' বল্লে—"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পর্কে তিনি আমার জ্যাঠামশাই।"

হেমাঙ্গ বাবু যেন বোকা বনে গেলেন। তিনি ভড়্কে গিয়ে বল্লেন—"তাই নাকি! রবীন্দ্রনাথের ভাইপো তুমি? তা তো জান্তাম না!"

পরদিনই সত্যব্রতের মিথ্যা কথা ধরা পড়ে' গেল। হেমাঙ্গ বাবু ক্লাশে এসেই সত্যব্রতের খোঁজ করলেন,—কিন্তু সত্যব্রতর আর কয়েকদিন দেখা নাই।

কয়েকদিন স্কুল কামাই করে' যেদিন সে ক্লাশে এলো, হেমাঙ্গ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছিল তোমার, জ্যাঠা-মশাইয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলে বোধ হয়?"

মাথা চুল্কে সত্যব্রত বল্লে,—"না স্যার, পেটের অসুখ হয়েছিল!"

—"বাজারের তেলেভাজা ফুলুরি খেয়েছিলে বুঝি ?"

—"না স্যার, চীন দেশ থেকে আমার বড় মামা দেড়শো বছরের পুরাণো হাঁসের ডিম পাঠিয়েছিলেন। সেই ডিমের কালিয়া খেয়ে পেট খারাপ হয়েছিল।"

হেমাঙ্গ বাবু সত্যব্রতকে ভালো করেই চিন্‌তে পেরেছেন। গম্ভীর হয়ে তিনি বল্লেন, "হুঁ, দেড়শো বছরের পুরাণো হাঁসের ডিম না ঘোড়ার ডিম! তোমার মাথা আর মুণ্ডু। ফাজিল ফক্কড় কোথাকার! তোমার নাম 'সত্যব্রত' কে রেখেছিলেন ?"

সত্যব্রত মুখ কাচুমাচু করে' বল্লে—"স্যার,—পিসীমা।"

হেমাঙ্গ বাবু—"তিনি কে ?"

সত্যব্রত বল্লে—"সরোজিনী নাইডু।"

আমরা হো হো করে' হেসে উঠলাম। হেমাঙ্গ বাবু বল্লেন—"দাঁড়াও, তোমার বাবার সঙ্গে আজই দেখা করতে হচ্ছে। তোমার ডেঁপোমী ভাঙ্গতে হবে। তিনি কখন বাড়ী থাকেন ?"

সত্যব্রত বল্লে—"স্যার, তিনি এখানে নেই,—বর্দ্ধমান গেছেন তাঁর ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে।"

সত্যাব্রতের মিথ্যাব্রত

হেমাঙ্গ বাবু এতক্ষণে দস্তুর মত চটে' গেছেন। তিনি তেড়ে বল্লেন—"কে তাঁর 'ফ্রেণ্ড্' ?"

সত্যব্রত বেশ কৃতিত্বের ঢোঁক গিলে বল্লে—"বর্দ্ধমানের মহারাজা।"

একদিন সত্যব্রতর পকেটে একটা রং-চঙে রুমাল দেখা গেল। আমাদের ক্লাশের জনার্দ্দন বল্লে—"বাঃ, বেশ রুমালটা তো!"

ব্যস্ আর যায় কোথায়! সত্যব্রত বল্লে—"যাঃ, যাঃ,—এ রুমালের মর্ম্ম তোরা কি বুঝবি! বিষ্ণু দিগম্বরের নাম শুনেছিস্? সেই যে—যার জোড়া গায়ক সারা ভারতে আর ছিল না। সেই বিষ্ণু দিগম্বর ছিলেন আমার কাকার সাগরেদ। আফ্‌গানিস্থানের রাজা আমানুল্লা যখন বোম্বাইয়ে এসেছিলেন, তখন সেই বিষ্ণু দিগম্বরের মুখে দরবারী কানাড়া শুনে খুসী হয়ে তিনি তাঁর মাথার পাগ্‌ড়ী খুলে তাঁকে উপহার দেন। সেই পাগ্‌ড়ীর আধখানা দিগম্বর মশাই কাকার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কাকা তাই নিয়ে বালাপোষ বানিয়েছেন।

একটুকরো বেঁচেছিল, তাই দিয়ে আমি রুমাল তৈরী করেছি।”

আর একদিন সত্যব্রত কোথা থেকে একটা ভোঁতা ভাঙ্গা-চোরা Fountain pen এনে হাজির করলো। আমরা ঠাট্টা করে' বল্লাম, “এটা বুঝি তোর ঠাকুর্দ্দাকে জার্ম্মানীর কাইশার উপহার দিয়েছিলেন ?”

সত্যব্রত মুখ গম্ভীর করে' বল্লে, “এর অর্থ তোরা কি বুঝবি ? তোরা তো শিখেছিস্ খালি জ্যাঠামি আর ফক্কুড়ি করতে—আর কথায় কথায় দাঁত বের করে' হাস্‌তে। এই Fountain pen দিয়ে বিদ্যাসাগর মশাই 'আখ্যান-মঞ্জরী' লিখেছিলেন। তারপর, তাঁর কাছ থেকে পান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'মেঘ-নাদ বধ কাব্য' লিখ্‌তে লিখ্‌তে এই কলমটি চুরি যায়। আমার ঠাকুর্দ্দা পুলিশে বড় কাজ করতেন। তিনি চোরা-বাজার থেকে এটিকে যখন উদ্ধার করলেন তখন বিদ্যাসাগর মশাইও নেই—মাইকেলেরও মৃত্যু হয়েছে। কাজেই সেই থেকে ওটা আমাদের বাড়ীতেই আছে।”

সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত

সত্যব্রতের এই মিথ্যা গল্পগুলি শুনতে আমাদের বেশ মজাই লাগত।

সত্যব্রত কি না জানে! ঘোড়ায় চড়তে তার মত ওস্তাদ নাকি দুটি নেই, সে নাকি মাছের চেয়েও বেশী ভাল সাঁতার জানে, চোখ বুজে দেড়শো মাইল 'স্পীডে' সে যে-কোনো মোটর—যে-কোনো রাস্তায় চালাতে পারে।

তার মোটর চালান, কি ঘোড়ায় চড়া আমরা পরীক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। তবে স্কুলের পুকুরে তার সাঁতার কাটবার কেরামতি আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

প্রথমে তো সে কিছুতেই জলে নামবে না।—"এ ভারী বিদ্‌ঘুটে এঁদো পুকুর,—এতে নামাও যা, আর একটা ডোবার জলে ডিগবাজী খাওয়াও তা,—তোদের যা 'টেষ্ট্'! থাকত আমার মামার বাড়ীর পুকুর—তবে দেখ্‌তিস্ সাঁতার কাকে বলে।"

কিন্তু জনার্দ্দন তা মান্‌বে কেন, সে মারলে পিছন দিক থেকে এক পেল্লাই ধাক্কা। ঠিক্‌রিয়ে গিয়ে সত্যব্রত পড়ল পুকুরের গভীর জলে। আর তার দেখা নাই! আমরা

ভাবছি সত্যব্রত বুঝি ডুব-সাঁতারে একেবারে ওপারে গিয়ে উঠবে।

কিন্তু সত্যব্রত কই? আমাদের মুখ শুকিয়ে আম্‌সী হয়ে গেল।

আমরা সবাই অল্পবিস্তর সাঁতার জানতাম। সকলে মিলে পুকুরের তল থেকে যখন সত্যব্রতকে তুললাম তখন সে খাবি খাচ্ছে।

তিন-চার দিন পরে সত্যব্রত ক্লাশে আসতেই জনার্দ্দন টিট্‌কারী দিয়ে বল্লে—"জলের মাছের খবর কি?"

সত্যব্রত বল্লে—"যত সব তালকানা, আনাড়ি, নূতন একটা কায়দা দেখাবার মত্‌লব করছিলাম, হতভাগারা সব 'প্ল্যান' মাটি করে' দিল।"

আমরা সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগলাম।

জনার্দ্দন বল্লে—"ভাগ্যিস্ 'প্ল্যান্'টা মাটি করে' দিয়েছিলাম!"

অনেক দিন পর সেদিন বৌবাজারের মোড়ে সত্যব্রতের সঙ্গে দেখা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তখন চীনাবাদাম খাচ্ছিল।

সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত

চেহারার কিছু পরিবর্ত্তন দেখলাম। সত্যব্রত বেশ একটু বাবু ধরণের লোক ছিল ; এবার দেখলাম তার মাথার চুল ছোট ছোট করে' কাটা—গায়েও খুব সাধারণ জামা-কাপড়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে সত্যব্রত, খবর কি ? কোথায় ছিলে এতদিন ? রোগা হয়ে গেছ যে !"

চীনাবাদাম চিবুতে চিবুতে সত্যব্রত বল্লে—"মেসো-মশাইয়ের আশ্রমে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম।"

"মেসো-মশাইয়ের আশ্রম ? সে আবার কোথায় ? মেসো-মশাই বুঝি সাধু-টাধু কেউ হবেন ?"

গম্ভীরভাবে সত্যব্রত বল্লে—"না, সবরমতী আশ্রম।"

বল্লাম—"সেখানে বুঝি তোমার মেসো থাকেন, তাঁর নাম কি ?"

সে আরো গম্ভীর হয়ে বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই বল্লে—"মহাত্মা গান্ধী।"

সোডার বোতল খুললে যে রকম ভস্ করে' সশব্দে গ্যাস্ বেরিয়ে পড়ে, আমার হাসিও তেমনি বুক্ ঠেলে ঘেরিয়ে আস্তে চাইল। অনেক কষ্টে তা চেপে বল্লাম—"তুমি

বাঙ্গালী,—মহাত্মা গান্ধী তোমার মেসো-মশাই হলেন কি করে ?"

সত্যব্রত বল্লে—"মহাত্মাজীর স্ত্রী আমার মায়ের মামাতো বোন। মায়ের এক মামা গুজ্‌রাটি মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। কস্তুরীবাই—অর্থাৎ গান্ধীজীর স্ত্রী আমায় সেই গুজ্‌রাটি দিদিমার সম্পর্কে বোনঝি। তা' হলেই কস্তুরীবাই হচ্ছেন আমার মাসীমা আর 'অটোমেটিকেলি' গান্ধীজী আমার মেসো-মশাই।"

ঢং ঢং করতে করতে একটা ট্রাম এসে মোড়ের মাথায় থাম্‌তেই আমি তাতে চড়ে বসলাম।

সত্যব্রত বল্লে—"কোথায় চল্লে হে ?"

আমি বল্লাম—"পিসেমশাইয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে।"

সে বল্লে—"তোমার পিসেমশাই কে ?"

ট্রাম তখন চল্‌তে আরম্ভ করেছে। আমি চেঁচিয়ে বল্লাম—"লাট্‌সাহেব।"

সকাল থেকেই বেশ মেঘ করেছে।

বেলা তখন আট্‌টা হবে,—আমি ঘরে বসে' একমনে খবরের কাগজটা উল্‌টে পাল্‌টে দেখছি, এমন সময় বন্ধুবর মোহনলাল এসে হাজির!

বোর্ডিংএর চাকর জগন্নাথকে ডেকে বল্‌লাম, "ওরে, চট্‌ করে' দু' কাপ চা আর কিছু গরম জিলিপি নিয়ে আয় শীগ্‌গির!"

মোহনলাল বল্‌ল, "ওহে, আমি এইমাত্র চা খেয়ে আসছি, শুধু তোমার জন্যেই আন্‌তে দাও!"

"আরে, সে কি হয়! আর এক কাপ চা খেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, দিনটা আজ বেশ ঠাণ্ডা আছে!"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহনলাল বললে, "দিনটা আজ ঠাণ্ডা আছে বলেই তো একটা মতলব নিয়ে তোমার

কাছে এলাম। আজ রবিবার আছে, চল কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাক।"

মতলবটা আমার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগ্‌ল না। মোহন-লালের সঙ্গে অনেক দিনই এরকম আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। গত রবিবারেও আমরা ব্যারাকপুরে এক বাগানে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে মনে করেছ? এমন জায়গায় চল যেখানে গাঁটের পয়সাও বেশী খরচ হয় না, অথচ কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে আসাও হয়।"

মোহনলাল বল্‌লে, "ডায়মণ্ড হারবার লাইনে 'গড়িয়া' বলে' একটা জায়গা আছে, জায়গাটা শুনেছি খুব সুন্দর। সেখানকার হাটও নাকি একটা দেখ্‌বার জিনিষ। কলকাতার খুব কাছে, বেশী খরচেরও ভয় নেই!"

আমি বল্‌লাম, "কখন ফিরবে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মোহনলাল বল্‌লে, "এখন সওয়া আট্‌টা; বারোটার মধ্যে আমরা ফিরব নিশ্চয়ই। আজ রবিবার, তোমাদের বোর্ডিংএর খাওয়া-দাওয়া হ'তে আজ

অনেক দেরী হবে; কাজেই অসুবিধার কোনই কারণ নেই।"

ততক্ষণে চা আর জিলিপি এসে গেছে। দু'মিনিটের মধ্যে সেগুলির সুব্যবস্থা করে' আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

ভাগ্য ভালো। শিয়ালদায় এসে দেখলাম, ডায়মণ্ড-হারবারের গাড়ী গার্ডসাহেবের সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা গাড়ীতে বস্‌লাম, গাড়ীও ছেড়ে দিল।

একে একে বালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর পেরিয়ে ট্রেণ হুশ্ হুশ্ করে' ঝড়ের মত ছুটে চলেছে। যাদবপুর ছাড়িয়ে যেতেই আমাদের চোখে পড়লো দু'ধারের দিগন্তবিস্তৃত নীচু জমি! ধূ-ধূ করছে ফাঁকা মাঠ। শোনা যায় বর্ষাকালে এই সব জমিতে রীতিমত বান ডাকে, তখনকার রূপ দেখলে কেউ ধারণা করতে পারে না—এখানে কোনোকালে মাঠ ছিল! মনে হয় ট্রেণ কোন সীমাহীন নদীর সেতুর উপর দিয়ে চলেছে!

পরের ষ্টেশনই 'গড়িয়া'। গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। ছোট্ট ষ্টেশন। ভদ্রলোকের মধ্যে আমি আর মোহনলালই নাম্‌লাম; আর যারা নামলো, তাদের মধ্যে ছিল কয়েকজন

জেলে, কয়েকটি উড়ে, একজন ডাক-হরকরা, আর কয়েকটি লুঙ্গিপরা মুসলমান কারিকর।

গাড়ী থেকে নাম্‌তেই, হাঁপাতে হাঁপাতে একটি রোগামত ভদ্রলোক এসে আমাদের বল্‌লেন, "আপনারা তো কলকাতা থেকে আসছেন?"

মোহনলাল আর আমি একসঙ্গে বল্‌লাম, "হাঁ।"

ভদ্রলোকটির গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো। এতক্ষণ বোধ হয় খালি গায়েই ছিলেন, হঠাৎ অপরিচিত দুটি ভদ্রলোকের ছেলেকে দেখেই বোধহয় ভদ্রতার খাতিরে ঐ কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়েছেন।

তিনি বল্‌লেন, "মহেন্দ্র বাবু এলেন না?"

মনে মনে বুঝলাম ভদ্রলোক ভুল করেছেন। বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। চোখের ইসারায় মোহনলালকে কোন কথার উত্তর দিতে মানা করে' আমি বল্‌লাম, "না, বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় তিনি আস্‌তে পারলেন না।"

ভদ্রলোক তখন আমাদের আপ্যায়িত করে' ডেকে নিয়ে পথ দেখিয়ে তাঁর বাড়ীতে চল্‌লেন। ভদ্রলোক একটু এগিয়ে

অজানা কুটুম

যেতেই আমি মোহনলালকে খুব আস্তে আস্তে বল্‌লাম, "দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! বিপদ্ বুঝলে সট্‌কে পড়া যাবে।"

মোহনলালও মুচ্‌কি হেসে আমার কথায় সায় দিল।

মাঠের রাস্তা ধরে' আমরা চলেছি। মাঝে মাঝে পথের দুই ধারে বাঁশের ঝাড় আর তার আশে-পাশে এঁদো পুকুর। জনশূন্য গ্রাম। দু'এক জায়গায় শুধু দেখ্‌লাম, কয়েকটি ছেলে পুকুরের জলে নেমে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

হাসি-কান্না

অনেকখানি পথ হেঁটে আমরা একটা টিনের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লাম। বাইরের ঘরে আমাদের বসিয়ে ভদ্রলোকটি ছুটে ভিতরে গেলেন। টের পেলাম ভিতরে বেশ সাড়া পড়ে' গেল। দুই একটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বোধ হলো যেন আশপাশের জান্‌লা দিয়ে বাড়ীর মেয়েরাও উঁকি ঝুঁকি মারছে!

ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমি আর মোহনলাল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌লাম। এখন পর্য্যন্ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। দেখা যাক্ শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়!

ছোট্ট একখানা বৈঠকখানা ঘর। বেশ ফিট্‌ফাট করে' সাজানো। তক্তপোষের উপর একটা পরিষ্কার সাদা চাদর বিছানো। এক পাশে একটা টেবিল, তার উপরে অনেকদিনের পুরানো একখানা আয়না, একধারে একটা ছোট টাইমপিস ঘড়ি টিক্ টিক্ কর্‌ছে। টিনের দেয়ালে কতকগুলি রং-চংএ ক্যালেণ্ডার টাঙানো, ঘরের এক কোণে একটা কাপড় জড়ানো লম্বা মতন কি জানি ঝুলছে! মনে হলো বোধ হয় এস্রাজ।

আমরা জুতো খুলে তক্তপোষের উপর উঠে বস্‌লাম।

অজানা কুটুম

ডুরে সাড়ী-পরা নোলক-নাকে একটি ছোট্ট মেয়ে হাঁ করে' আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মোহনলাল বল্‌ল, "খুকী, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার ?"

আঁচল ঘুরিয়ে খুকী এক ছুটে ভিতরে চলে' গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ভদ্রলোকটি দু'টো নেয়াপাতি ডাব কেটে এনে আমাদের সাম্‌নে ধরে' বল্‌লেন, "এখন এই ডাবের জলটুকু খান, চা হচ্ছে। চা খেয়ে তারপর মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমাদের দম ফেটে হাসি বেরিয়ে আস্‌ছিল, মোহনলাল হাসি চাপ্‌তে না পেরে খুক্ খুক্ করে' কাশতে আরম্ভ করে' দিল।

কিছুক্ষণ পরেই চা এলো, তার সঙ্গে গরম গরম ফুলকো লুচি আর আলুর দম। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে খাবারগুলো সাবাড় করে' ফেল্‌লাম।

তারপর মেয়ে দেখার পালা। লালরঙের সাড়ী পরা একটি খুকীর হাত ধরে' ভদ্রলোক আমাদের ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "নাও মা, প্রণাম কর।"

হাসি-কান্না

খুকী আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল

হাসি চেপে চেপে মোহন লালের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমারও মারাত্মক রকমের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হেসে ফেল্লেই সবমাটি! যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এর নামটি কি?"

ভদ্রলোক দিকে চেয়ে বল্লেন, "বল মা, নাম বল।"

মুখ নীচু করে' অতি অস্পষ্ট ভাষায় খুকী বল্ল, "নিস্তারিণী দাসী।"

মোহনলাল বল্ল, "বাঃ, বেশ নাম!"

আমি ভদ্রলোকটিকে বল্লাম, "আচ্ছা, এখন ওকে ভিতরে নিয়ে যান্।"

ভিতরে আর নিয়ে যেতে হলো না, চৌকাঠ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়ে এক লাফে খুকী অন্দরে চলে' গেল।

আমরা বল্লাম, "এখন তবে উঠি?"

ভদ্রলোকটি হাতযোড় করে' বল্লেন, "তা কি হ'তে পারে! এই ভর-দুপুর বেলা, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। আমি কিছুতেই ছাড়ব না। চান করে' খেয়ে দেয়ে খানিক বিশ্রাম করে' বিকেল বেলার দিকে যাবেন।"

মনে মনে ভাবলাম—বোর্ডিংএ গিয়ে তো সেই কলাইয়ের ডাল আর পুঁইশাকের ছ্যাঁচ্ড়া খেতে হবে, এমন খাসা ভোজটা ছাড়তে যাই কেন? মোহনলালের মনেরও সেই তুরীয় অবস্থা।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকটি একশিশি জবাকুসুম তেল আর শাদা ধব্ধবে দু'খানা তোয়ালে এনে বল্লেন, "আমাদের বাড়ীর পুকুরের জল খুব চমৎকার, চান্ করে' বেশ আরাম পাবেন।"

আচ্ছা করে' তেল মেখে স্নান করা গেল। বেশ পুকুর—চমৎকার জল! কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে উঠে পড়লাম।

স্নান সেরে আবার বাইরের ঘরে বসে' আছি। ভদ্রলোকটি ভিতরে খাবার ব্যবস্থা করতে গেছেন, এমন সময় ডাক-পিয়ন একখানা 'পোস্টকার্ড' দিয়ে চলে' গেল।

পরের চিঠি পড়া অন্যায়, কিন্তু পোস্টকার্ডের দু' একটা কথা হঠাৎ চোখে পড়ে যেতেই বাকি সবটুকু পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। দেখলাম চিঠিতে লেখা আছে—

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন মিদং—

মহাশয়, রবিবার আপনার কন্যাকে দেখিতে যাইব—এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ঘটনাচক্রে সেদিন আর যাইতে পারিব না, সোমবার সকালের গাড়ীতে অবশ্যই যাইব। শ্রীমান্ হরিমোহন ও কালীচরণ আমার সাথে যাইবে।

আমার বিনীত নমস্কার জানিবেন।

বশম্বদ

শ্রীমহেন্দ্রলাল মজুমদার

চিঠিখানা পড়ে' জলের মত সমস্ত জিনিষটা বুঝতে পারলাম।

অজানা কুটুম

ভাগ্যিস্ চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে পড়ে নাই! তা হলেই হয়েছিল আর কি!

চিঠিখানা গোপনে পকেটে পূরে ফেল্লাম! মোহনলালকে বল্লাম, "ছাখ্, যতক্ষণ এখানে আছি, তুই হরিমোহন আর আমি কালীচরণ—বুঝ্লি?"

বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষিধের চোটে নাড়ী টন্‌টন্ করছে। ভদ্রলোকটি বারে বারে এসে হাতযোড় করে' বলে' যাচ্ছেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন, মাংসটা প্রায় হয়ে এলো!"

যথাসময়ে খাওয়ার ডাক পড়লো। ভাত কই! এ যে পোলাও, সারি সারি বাটীতে ডাল, কই মাছের কালিয়া, গল্‌দা চিংড়ির ঝোল, মাংসের কোরমা, ভাজা-ভুজি, অম্বল, তারপর এলো দই আর সন্দেশ।

ভদ্রলোকটি বল্লেন, "পায়েসটা আর হয়ে উঠ্‌ল না কিছুতেই!"

আমি বল্লাম, "না না এই যথেষ্ট, এত আয়োজনেরও কোন দরকার ছিল না।"

ছাগল গেলার পর অজগর সাপের যা দশা হয়, আমাদের দশাও তাই হলো, একেবারে 'নট্ নড়ন্ চড়ন্' !

সমস্ত দুপুরটা পড়ে' নাক ডাকিয়ে ঘুমালাম। বিকেল পাঁচটা তেইশ্ মিনিটে কল্‌কাতার গাড়ী। এই গাড়ীতেই আমরা ফিরব।

বিকেলেও ভদ্রলোক জলখাবার খেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু কাঁহাতক আর খাওয়া যায়! দুই কাপ চা খেয়ে আমরা ষ্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম। ভদ্রলোকটিও সঙ্গে চল্লেন আমাদের গাড়ীতে তুলে দিতে।

যথাসময়ে গাড়ী এলো, চড়ে' পড়লাম। ভদ্রলোকটি হাত যোড় করে' আবার বিনয় জানিয়ে বল্লেন, "অনেক কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না; মহেন্দ্র বাবু এলে খুবই সুখী হ'তাম।"

গাড়ী ছেড়ে দিল, আমি জানালা দিয়ে মুখ বের করে' বল্লাম, "ওঃ বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনার একখানা চিঠি ছিল,

দিতে ভুল হয়ে গেছে !” এই বলে’ হাত বাড়িয়ে সেই পোষ্ট-কার্ডখানি তাঁর হাতে গুঁজে দিলাম।

হুশ্ হুশ্ করতে করতে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলে’ গেল।

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

সেদিন ভোর বেলা শহরের সমস্ত দৈনিক খবরের কাগজ-গুলিতে এই সংবাদটি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

পাঁচশত টাকা পুরস্কার

বাগবাজারের গলিতে কে বা কাহারা একটি অজ্ঞাত বাঙ্গালী যুবককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারীর সন্ধান যে দিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ঘোষণাটি পড়ে' আমাদের গোবিন্দদা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গোবিন্দদা'কে তোমরা চেন না? ঐ যে যিনি

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

ঘুঁটের ব্যবসা করে' এক সময়ে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেছেন, যাঁর, অব্যর্থ ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন এক সময় সারা বাংলায় হুলুস্থুল লাগিয়ে দিয়েছিল।

"ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন!" তোমরা যে অবাক্ হয়ে যাচ্ছ! তোমাদের অবাক্ হয়ে যাবার কথাই তো! তখন তোমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ, জান্‌বেই বা কেমন করে'?

ছোট্ট ছোট্ট লাল শিশিতে নীল রংএর তরল ওষুধ, তার সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র থাক্‌ত। ব্যবস্থাপত্রে ছাপার অক্ষরে লেখা থাক্‌ত—"অতি সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, তাহাকে হাঁ করাইয়া এই অব্যর্থ পাঁচন এক ফোঁটা মুখে দিয়া দিবেন! খুব সাবধান, দেখিবেন পাচন খাওয়াইবার আগে যেন ছারপোকা মরিয়া না যায়! এই পাচন কার্য্যকারী না হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।"

এই পাচন এখন আর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে অবশ্যই তোমরা এক এক শিশি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারতে!

তারপর গোবিন্দদার "ভুঁড়ি-সংহারী মালিশ" এক অদ্ভুত আবিষ্কার। যত বিপুল ভুঁড়িই হোক না কেন—এই মালিশের

গুণে একদম আমসত্ত্বের মত চুপসে যেত! ভুঁড়িতে মালিশ লাগাবার পর পনেরো দিন মাত্র উপোসের ব্যবস্থা—তারপরেই ব্যাস হাতে হাতে ফল! সে ওষুধও আজকাল আর বাজারে নাই।

যাক্—গোবিন্দ-দা এখন ওসব আবিষ্কারের পথ ছেড়ে দিয়ে সখের গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছেন। এমন উর্ব্বর মস্তিষ্ক—তিনি আর ছোটখাট কাজে নষ্ট করতে রাজী নন। এই তো সেদিন তিনি একটা ডাকাতের দল প্রায় ধরে' ফেলেছিলেন আর কি! অবশ্য জানা গেল, সেটা ডাকাতের দল নয়, সেটা—"কংসহারী যাত্রা-পার্টি।"

এরকম ভুল অনেক বড় বড় গোয়েন্দারও হ'তে পারে। গভীর রাতে একদল লোক মুখে রং-চং মেখে ঢাল-তলোয়ার ছোরা-ছুরি নিয়ে যদি কোথাও যায়, কে না তাদের ডাকাতের দল বলে' মনে করে? গোবিন্দদারও তাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু ভুলতো নাও হ'তে পারত! কংসহারী যাত্রা-পার্টি না হয়ে, হয়তো ধ্বংসকারী ডাকাতের দলও হ'তে পারত!

আর একবার একটা টুক্‌রো চিঠির অংশ কুড়িয়ে পেয়ে

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

গোবিন্দদা একটা হত্যার ষড়্‌যন্ত্র ধরে' ফেলেছিলেন আর কি! চিঠির টুক্‌রোতে লেখা ছিল—

আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। না হলে···

তারপর অবিশ্যি চিঠির অপর অংশও পাওয়া গেল—সে দুটো অংশ জুড়লে দাঁড়ায়ঃ

প্রিয়নাথ,

বরিশাল থেকে যে রসগোল্লা এসেছে সেগুলো আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। না হলে পচে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা। তুমি নিশ্চয়ই এসো। ইতি,

সুধীন—

গোবিন্দদা সেদিন ষড়্‌যন্ত্র ধরতে গিয়ে খুব একচোট রসগোল্লা খেয়ে এসেছেন,—এতে তাঁর লাভ বই লোকসান কিছু হয় নাই।

যাক্, এইবার আপনাদের আসল গল্পটা বলি।

সেদিনকার খবরের কাগজে হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে গোবিন্দদা মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি গোপনে এই ব্যাপারের তদন্ত করে' পুলিশকে সাহায্য করবেন। ফাঁকতালে যদি পাঁচশ' টাকা লাভ করা যায়, তা এই মাগ্যির বাজারে

হাসি-কান্না

মন্দ কি! আর টাকা না পেলেই বা কি, খবরের কাগজে যখন বড় বড় করে' গোবিন্দদার বাহাদুরীর খবর বেরুবে—তখন··· গো বি ন্দ দা কে আর পায় কে?

সেদিন রাত্রি বারোটায় গোবিন্দ-দা বাসে চড়ে' কালীঘাট থেকে শ্যাম বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। অত রাত্রে বাসে বেশী কেউ ছিল না। ঠিক সামনের আসনে দু'জন ভদ্রলোক আর ঠিক তার পিছনে বসে গোবিন্দদা।

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

বাঙ্গালী দু'জনের মধ্যে একজনের খুব রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে কালো চশ্‌মা, আর এক-জনের বেশ বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা !

ফাঁকা রাস্তায় বাস হু-হু করে ছুটে চলেছে। গোবিন্দদা অন্যমনস্ক—সেই হত্যা-রহস্যের এখন পর্য্যন্ত কোনো কূল-কিনারা পান নাই।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো সেই রোগা লোকটি তার সঙ্গীকে বলছে,—"গোবর্দ্ধনকে মেরে ফেল্লাম।"

সঙ্গী প্রশ্ন করল—

"কি করে ?"

"বিষ খাইয়ে।"

এই পর্য্যন্ত, ব্যস্ !—গোবিন্দদার চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করে' জ্বলে উঠল, আগুনের মত গরম নিশ্বাস পড়তে লাগ্‌লো,—ওঃ একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়েছে ! পাছে কোনো রকমে সন্দেহ করে—তাই গোবিন্দদা মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে লোকদুটোর উপর কড়া নজর রাখতে লাগলেন।
আর ছাড়াছাড়ি নাই কিছুতেই।

হাসি-কান্না

বাগবাজারের মোড়ে লোক দুটো নাম্‌ল।—হ্যাঁ—এই বাগবাজারের কোনো গলিতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি? তোমরা ঘোরো ডালে ডালে, গোবিন্দদা ঘোরেন পাতায় পাতায়!

গোবিন্দদা বাম দিকে নেমে চুপে চুপে খুনে লোকটিকে অনুসরণ ক'রে চল্‌লেন। বাড়ীটা জেনে এক্ষুণি পুলিশে খবর দিতে হবে।

ঐ যে বাড়ী, গ্যাসের আলোতে বাড়ীর নম্বরটা বেশ পড়া যাচ্ছে—১৫ নম্বর। আচ্ছা দাঁড়াও।

গোবিন্দদা পুলিশে ফোন করলেন—"হ্যালো, শীগ্‌গির আসুন, হত্যাকারীকে ধরেছি; ঠিকানা ১৫নং—ষ্ট্রীট, আমি বাড়ীর সামনেই অপেক্ষা করছি।"

পুলিশ এলো, গোবিন্দদা সেই রোগা লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "এই আসামী।"

* * * *

তার পরের দিনের ঘটনা। গোবিন্দদা মুখ চুন করে' বাড়ী এলেন। তিনি আমাদের কিছু বল্‌লেন না বটে, তবে আমরা

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

খবর পেলাম গোবিন্দদা হত্যাকারী সন্দেহ করে' একজন উদীয়মান সাহিত্যিককে ধরে ছিলেন।

সাহিত্যিক বেচারীর একটি উপন্যাস সাময়িক একটা কাগজে প্রতি সপ্তাহে বের হচ্ছিল। সেই উপন্যাসের নায়ক হচ্ছেন গোবর্দ্ধন। সেই গোবর্দ্ধন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে—পরের সংখ্যায় এই

বিষয়টি বেরুবে—তাই সাহিত্যিক বায়োস্কোপ দেখে ফিরবার পথে সেই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। গোবিন্দদা অতটা বুঝতে পারেন নি।

তা গোবিন্দদার আর কি দোষ? ভুল তো সকলেরই হয়।

অভিরামকে হঠাৎ কাব্যরোগে ধরেছে। এটা যে একটা রোগ তা' আমাদের আগে জানা ছিল না,—কিন্তু বিখ্যাত কবিরাজ পঞ্চানন তর্কচুঞ্চু মহাশয় যেদিন অভিরামের অবস্থা শুনে তার নাড়ী দেখে বললেন—"অতি জটিল ব্যাধিতে ধরেছে অভিরামকে ; আশু প্রাণঘাতী না হলেও, এ রোগের পরিণাম অতি ভয়াবহ,—উন্মাদ, অপস্মার, পক্ষাঘাত, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি দুঃসাধ্য ব্যাধি এর থেকে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াতে পারে", সেদিন অভিরামের মামা গোবর্দ্ধন বাবু যেন বেশ একটু ঘাব্‌ড়ে গেলেন। অভিরাম তাঁর বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করছে, কাজেই তাঁর দায়িত্ব অতি গুরুতর। ছেলেটা যদি শেষ পর্য্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তা' হলে তো তার জন্যে অভিরামের বাপ-মায়ের কাছে তাঁরই জবাবদিহি দিতে হবে।

দারুণ ভয় পেয়ে তিনি কবিরাজ মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন —"এ রোগের কোন ওষুধ নাই ?"

কবিরাজ মশাই দুই টিপ নস্য নাকে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, "ব্যাধি মাত্রেরই ওষুধ আছে,—বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সর্ব্বরোগে ধন্বন্তরি। কাব্যরোগের চিকিৎসা করতে হলে উন্মাদ রোগের পূর্ব্বাবস্থার চিকিৎসা করাই প্রয়োজন! সহস্রপুটিত কাংস্যভস্ম, বৃহৎ সূর্য্যোদয় মকরধ্বজ ও ষড়্‌গুণবলি-জারিত পর্পটিচূর্ণ, বৃহদঙ্গারক রস সহযোগে বটিকা তৈরী করে' সেবন করাতে হবে। আর মহাগোপিণ্ড তৈলের সঙ্গে স্বরভেদান্তক রস মিশিয়ে প্রতি দণ্ড অন্তর ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিতে হবে। এতেও যদি রোগ না সারে, তবে অন্য ব্যবস্থা আছে।"

বাস্তবিক অভিরামটা ক্ষেপে উঠেছে! কথায় কথায় সে কবিতা বলে, পথ চল্‌তে চল্‌তে সে কবিতা আওড়ায়, ঝিমোতে ঝিমোতে তার মুখ দিয়ে ছন্দ বেরোয়, আর স্বপ্নের ঘোরেও সে মধ্যে মধ্যে কবিতা বলে' ওঠে।

ছেলেবেলা থেকে অভিরামের সঙ্গে আমাদের জানাশোনা,

কাব্যরোগের টোট্‌কা

—কিন্তু আগে তো তার এ রোগ ছিল না! সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা তার এই কাব্যরোগ সম্বন্ধে আগে কিছুই জানতাম না। প্রথম রোগের লক্ষণ টের পেলাম সেদিন, যেদিন ইতিহাসের ক্লাশে শম্ভুনাথ মাষ্টার অভিরামকে ইতিহাসের পড়া জিজ্ঞাসা করলেন।

শম্ভু বাবু বল্লেন, "শাজাহান সম্বন্ধে কি জান বল অভিরাম।"

অভিরাম দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—

"এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান্—
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধান-মান,
শুধু তব অন্তর বেদনা—"

আরে, অভিরাম আবোল্-তাবোল্ এ কি বলতে আরম্ভ করেছে?

শম্ভু বাবু বল্লেন, "রবীন্দ্রনাথের শাজাহানের কবিতা তোমাকে আবৃত্তি করতে বলি নাই, ডেঁপো ছোকরা! পড়া যা শিখেছ তাই বল।"

সেইদিন আবার ভূগোলের ক্লাশে গজাননবাবু এসে যখন

অভিরামকে প্রশ্ন করলেন, "আন্দামান দ্বীপ কোথায় অবস্থিত, বল।"

অভিরাম তৎক্ষণাৎ উঠে গড়্ গড়্ করে' বলে' গেল—

"সুন্দর বনের ধারে বৃন্দাবন ধাম
তার কাছে আছে দ্বীপ আন্দামান নাম।"

উত্তর শুনে আমরা ক্লাশশুদ্ধ সবাই একসঙ্গে অট্টহাসি হেসে উঠ্লাম।

অমন গম্ভীর গজানন বাবুর মুখেও একবার বিদ্যুতের মত হাসি খেলে গেল,—কিন্তু তার পরক্ষণেই তাঁর মুখখানা হয়ে উঠল বাদল-আকাশের মত ঘোলাটে।

চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখ দুটো জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। তিনি অভিরামকে বল্লেন, "ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি হতভাগা! দাঁড়াও বেঞ্চের উপর কাণ ধরে'।"

কিন্তু মাষ্টার মশাইয়ের এই সামান্য একটা মুখের বকুনিতে কি আর অভিরামের প্রতিভা চাপা পড়ে? তুচ্ছ একটা পাথরের নুড়ি কি আর একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখ চাপ্‌তে

পারে ? অভিরামের কাব্য-প্রতিভা যেন একত্র উদ্দাম 'ঝড়', একটা উন্মত্ত 'সাইক্লোন', একটা উচ্ছৃঙ্খল 'টাইফুন' !

গজানন বাবুর ক্লাশের পর আমরা অভিরামকে জিজ্ঞাসা করলাম —"তুই এ রকম যা' তা' উত্তর দিলি কেন ?"

অভিরাম বল্লে, "শুনতে কেমন চমৎকার বল্ দেখি ! সুন্দরবন, বৃন্দাবন, আনন্দা মান—কী সুন্দর ঝঙ্কার ! একে বলে 'অনুপ্রাস'। তোরা ঠিক বুঝ্‌বি না !"

হাসি-কান্না

আমাদের ক্লাশের জগদ্দল বল্লে, "অনুপ্রাস্ না 'হনুপ্রাস্',—তার চেয়ে এই বল্লেই পারতিস্—

"সুন্দরবনের ধারে বৃন্দাবন ধাম
সেখানে বান্দর থাকে কবি অভিরাম।"

বান্দর অর্থাৎ বাঁদর!

জগদ্দলের এই ঠাট্টায় অভিরাম গেল বেজায় রকম চটে। সেই দিনই সে তাকে উপলক্ষ্য করে Black Boardএ লিখল—

"—বেঁটে আর মোটা যারা দুনিয়ায় ভাই,
তাদের মগজে শুধু ভরা থাকে ছাই;—
হাঁদা পেট,—নাদারাম—গাদা গাদা খায়
অষ্টরম্ভা দেখি শুধু কাজের বেলায়।"

বাস্তবিক জগদ্দল জোয়ার্দ্দার ছিল যেমনি মোটা তেমনি বেঁটে।

এই কবিতা পড়ে' জগদ্দল উঠল ভীষণ খাপ্পা হয়ে। সে মুখে কিছু না বলে' তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে Boardএ লিখল—

"মিচ্‌কে-পটাশ লিক্‌পিকে লোক
বাঁশের মত লম্বা;

কাব্যরোগের টোট্‌কা

ফচ্‌কেমিতে সবার সেরা—
কাজের বেলা রম্ভা।"

অভিরাম ছিল ছিপ্‌ছিপে রোগা আর লম্বা। এটা যে তাকে উপলক্ষ্য করেই লেখা হয়েছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই কবিতা দেখে অভিরাম নাক সিঁট্‌কে বল্লে, "রাবিশ্‌"। জগদ্দল বল্লে—

"যতই মনে ভাবিস্‌—
তোর কবিতাও 'রাবিশ্‌'।"

একটা চার আনা দামের শ্রুক্‌সারসাইজ খাতা অভিরামের কবিতায় ভর্ত্তি হয়ে গেল। প্রথম প্রথম তার কবিতা আমরা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই শুন্‌তাম, কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। আর কাঁহাতক শোনা যায়! যখন তখন সে আমাদের ধরে' কবিতা শোনাতো। কিন্তু নেবু বেশী চট্‌কালে তেঁতো হয়ে যায়। কাজেই কিছুদিন পর তার কবিতার কথা শুন্‌লে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

তারপর যেদিন 'মৌচাকে' তার একটা কবিতা ছাপা হোল,

সেই দিন থেকে দেমাকও তার গেল ভয়ঙ্কর রকমের বেড়ে। সে আর আমাদের সঙ্গে ভালো করে' কথা বলে না, তার ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয়, আমরা যেন তার চেয়ে অনেক নিম্ন-স্তরের লোক, তার প্রতিভা বুঝ্‌বার ক্ষমতা যেন আমাদের কারো নাই।

একদিন সে নিজের সম্বন্ধে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তে লাগল—

"সকল কবির সেরা কবি অভিরাম
গাদা গাদা কবিতা সে লেখে অবিরাম!"

তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জগদ্দল বল্‌লে—

"চেপেছে কবিতা-ভূত—গোভূতের ঘাড়ে,
ল্যাজ নেড়ে নেড়ে তাই মরিছে ভাগাড়ে।"

আবার অভিরাম বল্‌লে—

"অভিরাম অধিকারী কবি ও ভাবুক—"

জগদ্দল উত্তর দিল—

"গর্দ্দানেতে রদ্দা মারো,—লাগাও চাবুক!"

সেদিন জগদ্দল আর অভিরামে প্রায় মারামারি হবার

জোগাড়! আমরা সবাই এসে থামিয়ে না দিলে শেষ পর্য্যন্ত কি যে হোত বলা যায় না।

আমাদের ক্লাশে নতুন হেডপণ্ডিত এসেছেন, নাম তাঁর শ্রীমন্ত বাবু। লোকটি বেজায় কড়া, সর্ব্বদাই যেন রেগে টং হয়ে আছেন।

তিনি আমাদের যে সব ব্যাকরণের পড়া দিতেন, তা আর মুখে মুখে না নিয়ে খাতায় লিখতে দিতেন। কারণ, এতে হাতের লেখাও পাকে আর বানানও শুদ্ধ হয়।

একদিন এই রকম একটা শব্দরূপ আমাদের লিখ্‌তে বলে', এক টিপ্ নস্য নাকে দিয়ে তিনি চেয়ারে বসে' ঝিমোতে লাগ্‌লেন!

কবি অভিরাম তার খাতায় শব্দরূপের বদলে পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে' লিখল—

"পণ্ডিতজী শ্রীমন্ত
নাকের ভিতর নস্য গুঁজে
ক্লাশের মাঝে ঝিমন্ তো।"

হাসি-কান্না

অভিরামের পিছনের বেঞ্চে বসেছিল জগদ্দল! সে ছোঁ মেরে অভিরামের খাতাটা কেড়ে নিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের টেবিলের উপর রাখল।

কবিতা দেখে পণ্ডিত মশাই গর্জ্জে উঠলেন—"হুঁ, কে এই কাব্য-রসিক মাষ্টারদের নিয়ে ঠাট্টা করেছে?"

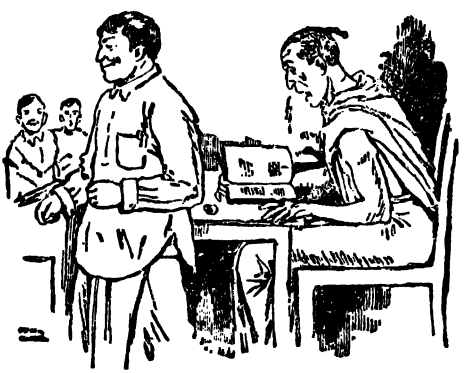

জগদ্দল বল্লে, "স্যার, অভিরাম অধিকারী।"

পণ্ডিত মশাই বল্লেন, "বটে বটে, কাব্যরোগে ধরেছে? আচ্ছা, আচ্ছা, এ রোগের টোট্‌কা আমার জানা আছে! যেমন রোগ তেমনি ওষুধের দরকার! এ অতি সংক্রামক ব্যাধি, প্রথম অবস্থাতেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" এই বলে তিনি অভিরামের খাতায় বড় বড় অক্ষরে লিখলেন—

কাব্যরোগের টোট্‌কা

"কুট্‌মলিত অজ্যি পর্ণী তুঙ্গভদ্রা ধারে,
খট্বারূঢ় ঘট্বজীবী ভট্টারক্ বারে
ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তুঙ্গভালে, সুভগস্তাবুক,
জিঘাংসা ও জুগুপ্সায় সদা পরাঙ্মুখ।"

তারপর অভিরামকে বল্‌লেন, "এক সপ্তাহ রোজ এক হাজার বার করে' এই কবিতাটি বিশুদ্ধ ভাবে লিখে এনে আমাকে দেখাবে, যদি একদিনও বাদ যায় তবে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।"

অদ্ভুত পণ্ডিত-মশাইয়ের টোট্‌কা! এক সপ্তাহ পরে অভিরাম গেল একদম বদলে। তার কাব্যরোগ গেল বিলকুল সেরে,—আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম!

জন্মদিন

ঐ একরত্তি মেয়েকে নিয়ে বাড়ীতে যেন চির-উৎসব লেগে আছে! এখনো দু'বছর তার পুরো হয়নি—চল্‌তে গিয়ে পা এখনো টল্‌তে থাকে—মুখের বোল্ এখনো ভালো করে' ফোটেনি।

ফুটফুটে চাঁদের মত রং, মাথায় একরাশ পশমের মত কালো কোঁকড়া চুল,—আর সব চেয়ে সুন্দর তার ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দু'টি!

রাতদিন সে কোলে কোলে ফেরে—এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল হলে মা অস্থির হয়ে পড়েন, পিসীরা ভেবে সারা হন—বাড়ীর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একটু সর্দ্দি কি গা গরম হলে আর রক্ষা নেই, রাজ্যের ডাক্তার-কবিরাজ এসে বাড়ীতে জড়ো হয়। সবার মুখেই 'কি হোলো'—'কি হোলো' প্রশ্ন।

হাসি-কান্না

তা হবেই বা না কেন! সারা বাড়ীতে ঐ একটি মাত্র শিশু। বনেদী ঘর, টাকা-পয়সার অভাব নেই,—অভাব ছিল খালি একটি ছোট ছেলে কি মেয়ের। তাই এই 'মঞ্জুরাণী' এসে বাড়ীর সকলের হৃদয় জয় করে বসেছে।

মঞ্জুর বাবা লোকেনবাবু ওকালতী করেন। সখের ওকালতী—তা না করলেও চলে। জমিদারের ছেলে তিনি, তবুও বসে' বসে' খাওয়াটা তাঁর ধাতে সহ্য হয় না। যে সব বড়লোকের ছেলে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বাপ-ঠাকুর্দ্দার সম্পত্তি ধ্বংস করে,—তাদের লোকেনবাবু রীতিমত ঘৃণার চোখে দেখেন।

লোকেনবাবুর প্রথম ছেলেটি মারা যাবার প্রায় দশ বছর পরে এই 'মঞ্জু' তাঁদের ঘরে এসেছে; তাই সমারোহের আর শেষ নেই।

প্রথম ছেলেটির মৃত্যুর কাহিনী বল্‌তে বল্‌তে আজও লোকেনবাবু 'হাউ হাউ' করে' ছেলেমানুষের মত কাঁদেন—আর সে কাহিনী যে শোনে, সেও আর চোখের জল রাখতে পারে না।

জন্মদিন

মোটে তিন বছর মণ্টুর বয়স হয়েছিল। ঐ বয়সেই তার টন্‌টনে বুদ্ধির পরিচয় যে পেত, সেই দস্তুরমত অবাক হয়ে যেত। যেমনি সুন্দর ছিল তার চেহারা, তেমনি ছিল তার স্বভাবটুকু। তার হাসিমাখা মুখখানি দেখে রাস্তার লোক তার সঙ্গে ডেকে ডেকে আলাপ করত।

মণ্টু চলে' গেছে আজ দশ বছর আগে। বাড়ীর কেউ আর তাকে ধরে রাখতে পারলো না। সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। মণ্টু সাজ্‌গোজ করে' বাবার কোলে চড়ে' 'ঠাকুর ভাসান' দেখ্‌তে যাবে—হঠাৎ সুরু হোলো তার ভেদ-বমি! তারপর? তারপর আর কি! বাড়ীর অন্যান্য সবাই যখন 'ভাসান' দেখে বাড়ী ফিরলো—মণ্টু তখন কতদূরে কে জানে!

মণ্টুর মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন,—মণ্টুকে যখন তাঁর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হোলো, তিনি চীৎকার করে' বললেন, "সাজিয়ে দাও—সাজিয়ে দাও—বাবাকে আমার সাজিয়ে দাও। তার বড় আদরের সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে দাও—মাথা আঁচড়িয়ে দাও—তার ছবির বইগুলি সঙ্গে দাও,

শেলেট্—খাতা—” তারপর মণ্টুর মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, ...তিন দিন আর তাঁর জ্ঞান হয়নি।

মঞ্জু এসে মণ্টুর স্থান জুড়ে বসেছে। সবার মুখে রাতদিন ‘মঞ্জু’ ‘মঞ্জু’ ‘মঞ্জু’। মঞ্জুর অনর্গল আধো আধো বুলিতে বাড়ী যেন ভরপুর।

বিকেল বেলা ঠেলা গাড়ী করে’ চাকরের সঙ্গে মঞ্জু বেড়াতে যায়, বাড়ীর লোকে হাঁ করে’ থাকে, মঞ্জু কতক্ষণে বাড়ী ফিরবে! মঞ্জু যতক্ষণ ঘুমায় সমস্ত বাড়ী যেন ঝিমিয়ে পড়ে, কারুর আর ভালো লাগে না।

জন্মদিন

মঞ্জুর ঠাকুর্দ্দার বয়স হয়েছে, এই বুড়ো বয়সে তিনি নতুন করে' মায়ার জালে আট্‌কা পড়েছেন। তিনি দুপুর বেলা যখন বিশ্রাম করেন, মঞ্জুকে তাঁর পাশে শোয়ানো চাই, সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখা চাই, না হলে তাঁর প্রাণ ছট্‌ফট্ করে।

মঞ্জুর মামার বাড়ী থেকে কতবার লোক এসে ফিরে গেছে, মঞ্জুর মায়ের আর বাপের বাড়ী যাওয়া ঘটে ওঠেনি! মঞ্জু চলে' গেলে যে, বাড়ী শ্মশান হয়ে উঠবে! কি করে' তাকে ছেড়ে থাক্‌বে, এই ভাবনায় সবাই অস্থির! তাই মঞ্জু জন্মাবার পর তার মায়ের আর বাপের বাড়ী যাওয়া হয়নি।

একদিন চাকরের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে মঞ্জুর ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। বাড়ীশুদ্ধ হৈ-চৈ। মা পাগলের মত হয়ে উঠ্‌লেন, পিসীরা ঘর ছেড়ে এসে পথের দিকে চেয়ে রইলেন,—দূরের থেকে কারুর পায়ের শব্দ শুন্‌লে চীৎকার করে' ওঠেন—"ঐ যে আস্‌ছে!" কিন্তু মঞ্জুর দেখা নেই! কাকারা চারদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করলেন, বুড়ো ঠাকুর্দ্দাও লাঠি-ভর দিয়ে ছুটে চল্‌লেন—মঞ্জুর সন্ধানে।

হাসি-কান্না

চাকরের সেদিন দুর্দ্দশার একশেষ। অনেক দিনের পুরাণো চাকর বলে চাকুরীটা বজায় রয়ে গেল, কিন্তু চড়-চাপড়ের ঝড়-ঝাপ্‌টা তাকে সহ্য করতে হোল অনেক।

আর একদিন বাড়ীতে রীতিমত কান্নাকাটি লেগে গেল। দুপুর বেলা বাড়ীর সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখেন — মঞ্জু নেই। প্রথমে মেয়েরা ভাব্‌লে, মঞ্জু বাইরে বাবুদের কাছে আছে।

ছোটপিসী বেলা তার ছোড়্‌দা বুচুকে বল্‌লে, "মঞ্জুকে

জন্মদিন

বাইরে থেকে এনে দাও না, অনেকক্ষণ দেখিনি।" ছোড়্‌দা বল্‌লে, "মঞ্জু তো বাইরে নেই! আমি তো মঞ্জুকে নিতেই ভিতরে এসেছি।"

ব্যস্! অন্যান্য পিসীরা উঠ্‌ল লাফিয়ে, মা ঘুমুচ্ছিলেন—তাঁর ঘুম গেল ছুটে,—কাকারা বাইরে থেকে ছুটে এলো—ঠাকুর্দ্দা তামাক খাচ্ছিলেন, গড়্‌গড়া ফেলে দৌড়ে এলেন। লোকেনবাবু বাড়ী ছিলেন না, তিনি ব্যাপারটা জান্‌তে পারলেন না।

মঞ্জু কৈ? খাটের তলা, আলমারীর পিছন দিক, সিন্দুকের পাশ, বাথরুম, রান্নাঘর, ভাঁড়ার চারদিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোল, কিন্তু মঞ্জু নেই কোথাও।

কী সর্ব্বনাশ! মঞ্জু কি তবে বাগানের পুকুরে পড়ে' গেছে! ওঃ, ধারণাও করা যায় না। মা ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন। পিসীদের কান্না শুনে পাড়ার লোক ছুটে এলো! বাড়ীর পুরুষদের দল রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গেলেন।

যাহোক্, মঞ্জুকে অবশেষে পাওয়া গেল। দেখা গেল, তাদের উড়ে মালীর কাঁধে চড়ে' মঞ্জুরাণী হাসতে হাসতে

আসছে। বুকে তার একটি গোলাপফুল গোঁজা, কানে দুটো শিরীশ ফুলের মঞ্জরী।

সাম্‌নের ফাল্গুন-পূর্ণিমায় মঞ্জু দু' বছরে পড়্‌বে। আর মাত্র মাসখানেক বাকী। ঠাকুর্দ্দা বললেন, "মঞ্জুরাণীর জন্মদিন এইবার জাঁকালো রকমে করতে হবে, বাড়ীশুদ্ধ সবাই দেশে গিয়ে এই উৎসব সম্পন্ন করব।"

লোকেনবাবু এই কথার উত্তরে কেবল বলেছিলেন, "অনর্থক এত খরচ করে' কি লাভ? এখানেই ধুমধাম করা যাবে,—দেশে যেতে হাঙ্গাম অনেক, খরচও অনেক।"

মঞ্জুর ঠাকুর্দ্দা এই কথায় বেশ একটু চটেছিলেন। বল্‌লেন, "আমার নাতনীর জন্যে যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি হাওয়ায় উড়ে যায়, তাতেও কারুর বাধা দেবার ক্ষমতা নেই।"

দেশে যাওয়াই ঠিক হয়ে গেল।

কীর্ত্তি-নাশা নদীর তীরে লোকেনবাবুর দেশ। গ্রামটি এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধিশালীই ছিল, কিন্তু পদ্মার ভাঙ্গনে গ্রামের এখন আর সে শ্রী-ছাঁদ নেই। অনেকের বাড়ীঘরই পদ্মার অতলতলে

তলিয়ে গেছে। ভিটে হারিয়ে তাই গ্রামের অনেক লোকই এখন বিদেশে চলে' গেছে।

লোকেনবাবু এই গ্রামের জমিদার।

দেশে গিয়ে মঞ্জুর জন্মদিনের উৎসব হবে, তাই বাড়ী শুদ্ধ আমোদে মেতে গেছে। মঞ্জুর পিসী আর কাকারা তো একেবারে আনন্দে দিশেহারা হয়ে উঠেছেন। ফাল্গুন-পূর্ণিমার আর মাত্র হপ্তাখানেক বাকী, এখন থেকে রওয়ানা না হলে আয়োজন করে' ওঠা যাবে না। জলের পথে অনেকদূর যেতে হবে।

পাঁজি দেখে যাত্রার দিন-ক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। তারপর একদিন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে, ঠিক সময়ে সকলে বেরিয়ে পড়লো দেশের দিকে।

প্রথমে রেলের পথ, তারপর ষ্টীমার, তারপর নৌকায় যেতে হবে প্রায় একদিনের রাস্তা।

স্থলপথ ও ষ্টীমারের জলপথ নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে শেষ রাতে সকলে এসে পৌঁছুলো ঘাটে। এইবার নৌকাযাত্রা আরম্ভ হবে।

দুইখানি বড় বড় নৌকা ঠিক করা হোলো। একটাতে যাবেন মঞ্জুর ঠাকুর্দ্দা আর বাড়ীর সরকার, গোমস্তা, ঠাকুর, চাকর ইত্যাদি, আর একটাতে যাবেন—মঞ্জুর বাবা, মা, পিসী ও কাকারা।

আকাশে তখন চাঁদ হেলে পড়েছে, ভোর হতে বেশী দেরী নেই। শীতের কন্‌কনে হাওয়া হু-হু করে' বইছে। বালাপোষটা ভালো করে' গায়ে জড়িয়ে ঠাকুর্দ্দা মঞ্জুর মাকে বল্‌লেন, "বৌমা, মঞ্জুকে আমার কাছেই দাও; ওর শরীরটা ভালো নেই, সারা ষ্টীমারে কেশেছে। তোমাদের কাছে থাক্‌লে কাকা ও পিসীদের আদরে ওর যত্নের চেয়ে অযত্নই হবে বেশী।"

মঞ্জুর কাকা ও পিসীরা এতে দারুণ আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর্দ্দার হুম্‌কিতে তাদের আপত্তি টিক্‌লো না।

দু'টি নৌকা পাশাপাশি চলেছে। ঠাকুর্দ্দার নৌকাতে মঞ্জু রয়েছে—এতে লোকেনবাবুরাও নিশ্চিন্ত। মঞ্জুকে তার মাও বোধ হয় অত যত্ন করতে পারেন না!

খালের জলে ভোরের আলো ঝল্‌মলিয়ে উঠল। দুই তীরের

জন্মদিন

ঝাপ্‌সা গ্রামগুলি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। গ্রামের বৌ-ঝিরা জল নিতে ঘাটে চলেছে, মোষের পিঠে চড়ে' রাখাল ছেলে চলেছে মাঠের দিকে,—গরুর গাড়ীতে খড়ের গাদা,—ধানের মরাইয়ের পাশে মুরগী ডাক্‌ছে—এমনি ধারা আরো কত কি দৃশ্য চোখে পড়তে লাগ্‌ল!

জোরে বাতাসে ভরা পালে নৌকা দু'টো ছুটে চলেছে তর্‌-তর্‌ করে'।

লোকেনবাবুদের নৌকা ঠাকুর্দ্দাদের নৌকা ছাড়িয়ে দূরে চলে' গেল। লোকেনবাবু চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "তোমরা এসো আস্তে আস্তে,—আমরা এগোলাম।"

বাঁকের মুখে পড়ে' লোকেনবাবুদের নৌকা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক বাটী গরম দুধ খেয়ে মঞ্জু তাজা হয়ে ঠাকুর্দ্দার কোলে উঠে বসেছে। কত রকম কথাই তার বলার ইচ্ছা! কিন্তু তার ভাষা বোঝে কার সাধ্য?

এক ঝাঁক নীলকণ্ঠ পাখী আকাশের একদিক থেকে আর

একদিকে উড়ে গেল। ঠাকুর্দ্দা মঞ্জুর হাত দু'টি কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লেন, "নমো কর।"

মঞ্জুর ভারী মজা, সে খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ল।

খালের একধারে কেমন সুন্দর নীল নীল ফুল ফুটে রয়েছে! মঞ্জু সেই দিকে আঙ্গুল দিয়ে বল্‌লে—"দাদু ফু, দাদু—ফু।"

ঠাকুর্দ্দা বল্‌লেন—"ফুল নিবি?"

মঞ্জু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"হুঁ—"

ঠাকুর্দ্দার আদেশে মাঝিরা সেই ফুলের কাছে নৌকা নিয়ে গেল।

অগাধ জল—মাঝিদের লগি ঠাঁই পায় না। বড় বড় নীল ফুলে আর পাতায় জলের অনেকটা জায়গা ছেয়ে আছে। মঞ্জু হাত বাড়িয়ে ফুল ধরতে চায়।

ঠাকুর্দ্দা মঞ্জুকে শক্ত করে' ধরে' নৌকার ধারে নিয়ে গেলেন —"নে, তোর সখ হয়েছে, নিজেই তোল্।"

"ঝুপ্!!" ঠাকুর্দ্দার দুর্ব্বল হাত মঞ্জুর ভার সাম্‌লাতে পার্‌লো না। নৌকা একবার কাৎ হয়ে আবার সোজা হয়ে গেল। সবাই আছে মঞ্জু নেই—!

জন্মদিন

সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! একি স্বপ্ন না সত্য! ঠাকুর্দ্দার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত একবার কেঁপে উঠ্‌ল—তারপর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে' তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সারা নৌকায় কোলাহল উঠ্‌ল। সরকার, গোমস্তা মাঝি প্রভৃতি যারা ছিল, সকলে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। জল তোলপাড় করে' কত খোঁজাখুঁজি হোল, কিন্তু সবই বৃথা!

ঠাকুর্দ্দার আর মঞ্জুর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

লোকেনবাবুরা অনেকক্ষণ হোলো গ্রামে পৌঁছে গেছেন। মঞ্জুদের নৌকা এখনো এসে পৌঁছায় নাই। অনেকক্ষণ মঞ্জুকে না দেখে তার পিসী ও কাকারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

লোকেনবাবু তাঁর স্ত্রীকে বল্লেন, "দুধটা গরম করে' বোতলে ভরে' রাখ, মঞ্জু এলেই খাইয়ে দিও। অনেকক্ষণ টাট্‌কা দুধ ওর পেটে পড়ে নাই।"

মঞ্জুর মা বল্লেন, "ওর জন্যে আর তোমাদের চিন্তা করে' কাজ নেই, ঠাকুর্দ্দা কাছে থাকতে 'মঞ্জুর' জন্যে আর কারো ভাব্‌তে হবে না। তুমি তার চেয়ে বরং খোঁজ করে' দেখ, গ্রামে কোথায় ভালো ঢুলি আছে! কাল সকাল থেকেই যেন বাড়ীতে বাজনার ব্যবস্থা হয়।"

ফাঁকি

"মা, আমার পায়ের কাছের জানালাটা খুলে দাওনা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, চাঁদ উঠেছে কি ?"

খোকনের বিছানার পাশেই মা বসেছিলেন। তিনি খোকনের মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন, "আজতো চাঁদ উঠ্‌বে না বাবা, আজ যে ভরা অমাবস্যা।"

"ওঃ, আজ অমাবস্যা, আজ আর চাঁদ উঠ্‌বে না! তা হোক্ মা, লক্ষ্মীটি, জানালাটা খুলে দাও। বন্ধ ঘরে আমার যেন হাঁপ ধরছে!"

মায়ের চোখ ছল্‌ছলিয়ে এলো, বল্লেন, "বাইরে বড় ঠাণ্ডা বাবা! হাওয়া লাগ্‌লে তোমার অসুখ বাড়বে। তুমি একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খোকন বল্লে, "মা, আজ আমি খুব ঘুমাব, আমার চোখ দুটো ঘুমে ঢলে' আসছে, মনে হচ্ছে

কে যেন জোর করে' চোখ দুটো আমার চেপে ধর্‌ছে। আজকে আমার মনে হচ্ছে আর যেন কোন রোগ আমার শরীরে নাই! আচ্ছা মা, ভালো হয়ে গেলে আর তো আমায় ঐ বিশ্রী তেতো ওষুধগুলি খেতে হবে না?"

"না বাবা, তুমি ভালো হয়ে ওঠ, তোমাকে আর কোন ওষুধ খেতে হবে না—"

"মা, ঐ ওষুধগুলোর কথা ভাব্‌লেই আমার যেন রোগ বেড়ে যায়। মা, বাবা কোথায়?"

"তিনি ডাক্তারের বাড়ী গেছেন।"

"কেন, ওষুধ আন্‌তে?"

"না, তুমি কবে ভালো হয়ে উঠবে—সে কথা জান্‌তে। তুমি এখন ঘুমাও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।"

খোকনের মা জানেন খোকন ভালো হয়ে উঠবে, কিন্তু তার বাবা জানেন খোকনকে হয়তো ধ'রে রাখতে পারা যাবে না,—কঠিন ব্যারাম। এ কথা খোকনের মাকে জান্‌তে দেওয়া হয় নাই।

দুই-তিন বছর আগে ঠিক এই বয়সেই খোকনের দাদা

ফাঁকি

রুণু বিদায় নিয়ে চলে' গেছে। সে বড় করুণ ইতিহাস।

রুণু ক্লাশে পরীক্ষায় বরাবর প্রথম হয়ে কত বই, কত মেডেল যে পুরস্কার পেয়েছে, তার বুঝি সীমা সংখ্যা নাই। তার প্রশংসায় স্কুলের শিক্ষকেরা ছিলেন শতমুখ।

রুণুর বাবা তাকে ছোট্ট একটি আলমারী করে দিয়েছিলেন—সেটা তার পুরস্কারের বই আর জিনিষপত্রে ভরে' গেছিল। আল্‌মারীটা ঠিক তেম্‌নি পড়ে' আছে, কিন্তু আজ রুণু নেই!

হাসি-কান্না

দাদা চলে' যাবার পর খোকন কয়েকদিন খুব কেঁদেছিল। তারপর সে আর কোনদিন কাঁদেনি। প্রায়ই দেখা যেত সন্ধ্যার সময় সে তার দাদার আলমারীর কাছে চুপ্ করে' বসে' আছে, তার চোখ দুটি জলে ভরা।

প্রায় আধ ঘণ্টা চুপ্ করে' থাকার পর খোকন ডাক্‌লে, "মা, তুমি কোথায় ?"

মা কাছেই ছিলেন, বল্লেন, "এই যে বাবা, আমি এখানেই আছি, তুমি ঘুমাও।"

"মা, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,—কি দেখলাম জানো ? দেখলাম, দাদা এসেছে। স্পষ্ট চিন্‌তে পারলাম। সেই বাদামী রংএর পাঞ্জাবীটা গায়ে ছিল। আমায় বল্লে, 'খোকন, আস্‌বি আমার কাছে ?' আমি বল্লাম, 'কেমন করে' যাব,—আমি যে পথ চিনি না !' দাদা বল্‌লে, 'আমি তোর হাত ধরে' নিয়ে যাব —কোন ভয় নেই !' আমার জানি কেমন ভয় ভয় করছে মা ! তুমি আমার কাছে এসে বস।"

মার বুকটা একটা অজানা আশঙ্কায় দুর্ দুর্ ক'রে উঠলো।

ফাঁকি

আঁচলে চোখের জল মুছে বল্‌লেন, "ভয় কি বাবা, তোমার দাদা তোমায় ভালবাসে বলে' স্বপ্নে দেখা দিতে এসেছিল। তুমি আর একটু ঘুমাও।"

ডাক্তারের বাড়ী থেকে খোকনের বাবা ফিরেছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। "আজ রাতটা কাট্‌লে রুগীর অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হতে পারে"—ডাক্তার এই অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু আজ রাতটা ভালোয় ভালোয় কাট্‌লে হয়। রুগীর নাড়ী অতি ক্ষীণ, বুকের অবস্থাও অতি শোচনীয়।

খোকনের বাবা মোহিনীবাবু পশ্চিমের একটা সহরে কাজ করতেন। প্রথম যখন এখানে আসেন তখন রুণু তিন বছরের শিশু, খোকন তখনো জন্মায় নাই। খোকনের জন্মের পর মোহিনীবাবু নিজে এখানে বাড়ী করেছেন। সুন্দর ছোট্টখাট বাগানঘেরা বাড়ী,—যে দেখতো সেই বলত "বাঃ—বাড়ী নয়ত যেন একখানি ছবি!"

মোহিনীবাবুর ছোট্ট পরিবারে—অগাধ শান্তি। দুটি ছেলে রূপেগুণে সমান, মোহিনীবাবুর স্ত্রীও যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিল।

রুণু চলে' যাবার পর থেকেই মোহিনীবাবুর স্ত্রীর ধরেছে ফিটের ব্যারাম। এখনো যখন রুণুর কথা তাঁর মনে হয় তখনি 'ফিট' হয়।

ডাক্তারের বাড়ী থেকে মোহিনীবাবু ফিরে এলে খোকনের মা বল্লেন, "আজ খোকনের অবস্থা অনেক ভাল মনে হচ্ছে,—জ্বর তেমন নাই, সমস্ত শরীরের ব্যথাও কমে গেছে, আহা বাছা আমার তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুক।"

মোহিনীবাবু বুঝলেন—এ বুঝি প্রদীপ নিভ্‌বার আগের উজ্জ্বল অবস্থা। খোকনের মাকে তিনি বল্লেন—"ছাখো, তাড়া-তাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও,—পালা করে' আজ আমাদের রাত জাগ্‌তে হবে, খোকনকে আজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে,—রাত না কাট্‌লে অবস্থার কথা ঠিক বলা যায় না।"

খোকনের মা বল্লেন—"তোমার আর রাত জাগতে হবে না, আমিই খোকনের তদারক করব। কয়দিন উপর উপর রাত জেগে তোমার চোখ দুটো যেন একেবারে গর্ত্তে বসে' গেছে! তোমার আবার একটা কঠিন ব্যামো না হলে হয়।—তুমি ঘুমাও —দরকার হলে তোমায় ডাকব!"

ফাঁকি

অমাবস্যার জমাট অন্ধকার রাত। বাইরে ঝড়ের বাতাস উঠেছে—সারা আকাশ মেঘে ছাওয়া। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধ ভাব। বাতাসের হুটোপুটির আওয়াজ ছাড়া আর কোনো কিছুরই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

'ঢং ঢং ঢং' দেওয়ালে টানানো ঘড়ির আওয়াজে মোহিনী বাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওঃ, কী ঘুমই না তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। পাশের ঘরেই খোকন আর তার মা! খোকন বোধ হয় ভালোই আছে, খারাপ

কিছু হলে খোকনের মা নিশ্চয়ই তাঁকে খবর দিতেন। যাক্, তবে ফাঁড়াটা কাটলো! মোহিনীবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে খোকনের ঘরে ঢুকলেন।

ঘর অন্ধকার—কারু সাড়া-শব্দ নাই, মা ও ছেলে দু'জনেই গভীর ঘুমে অচৈতন্য।

বাইরে কড়্ কড়্ করে' বাজ পড়লো। মোহিনীবাবু বাতি জ্বাল্লেন। মশারিটা তুল্তেই তাঁর হাত থেকে ঠন্ করে' লণ্ঠনটা মাটিতে পড়ে' গেল,—মোহিনীবাবু ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্লেন।

খোকন নেই—সে চলে' গেছে,—ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে,—তার দুষ্টু দাদা এসে তাকে চুরি করে' নিয়ে গেছে! সে নিজেও গেছে—আজ ছোট ভাইকেও নিয়ে গেল।

খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে' আছেন তার মা, তাঁরও জীবনের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

ভিখারিণীর ছেলে

ছোটু ভিখারিণীর ছেলে। সারাদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে মা যা ভিক্ষা করে' আন্‌তো, তাতেই কোনো রকমে মা ও ছেলের দিন গুজরাণ্ হোত।

ছোটু ছেলেমানুষ,—দশ বছরের বেশী তার বয়স হবে না কিছুতেই। এই বয়সেই সে তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝায় —"মা, আমি আর একটু বড় হয়ে নি, তোর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে দেব।" ছেলের কথায় দুঃখিনী মায়ের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—মনে মনে কতই আশা না জানি জাগে!

আজ কয়দিন হোলো ভিখারিণী অসুখে পড়ে' আছে। ছোট ছেলে ছোটু কি যে করবে ভেবে আর কূল-কিনারা পাচ্ছে না। মায়ের ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা তো দূরের কথা—পেটের ভাত জোটানোই এখন দায় হয়ে উঠেছে। রুগ্না মায়ের পথ্যের ব্যবস্থা না করলে তো মাকে বাঁচানোই কঠিন হয়ে উঠবে। ছোটু পাগলের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

হাসি-কান্না

ছোটুদের বাড়ী গাঁয়ের প্রায় শেষ সীমানায়। ছোটু যদি গাঁয়ে ভিক্ষায় বেরোয় তবে তার মার কাছে থাকবে কে? মা'র অবস্থা যে অতি খারাপ। কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

ছোটু নিজের জন্যে পরোয়া করে না। না খেয়ে সে অনেক দিন থাকতে পারে, এতে তার বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু মায়ের যে পথ্য চাই।

ছোটুর মুখের ভাব দেখে তার মায়ের বুকটা হু হু করে' ওঠে,—বলে, "ছোটু, তুই আমার জন্যে ভাবিস্ না রে,—উপোস করে' থাকাটাই হচ্ছে আমার অসুখের ওষুধ,—কিছু পেটে পড়্লে আমার ব্যামো বেড়ে যাবে। তুই যা, গাঁয়ের জমিদার চৌধুরীদের বাড়ী গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল,—জমিদার বাবুদের দয়া হলে কিছুদিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবি। তুই আমার জন্যে কিছু ভাবিস্ না।"

মায়ের কথা শুনে ছোটু জমিদার-বাড়ীর দিকে রওয়ানা হোল। সমস্ত কথা শুন্লে হয়ত জমিদার বাবুরা তাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন। ছোটু শুনেছে, চৌধুরীরা খুব দয়ালু

লোক, গরীব-দুঃখী কেউ তাঁদের বাড়ী থেকে শুধু হাতে ফেরে না। ছোটুর অবস্থার কথা শুনলে নিশ্চয় তাঁরা সাহায্য করবেন।

সারা বছরের মধ্যে পূজোর একটা মাস জমিদাররা এই দেশের গাঁয়ে এসে বাস করেন। এবারও এসেছেন। ছোটুর মা সে কথা জেনেই ছোটুকে জমিদার-বাড়ী যেতে উপদেশ দিয়েছে।

গাঁয়ে জমিদাররা এসেছেন, তাই সারা গ্রামে ধুম লেগে গেছে। এবারের ধুমধামের একটি বিশেষ কারণ, জমিদার বাবুর একমাত্র নাতির মুখে ভাত দেশের বাড়ীতেই হবে ঠিক হয়েছে।

গ্রামশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে,—কেউ বোধ হয় আর বাকী নেই।

এসব খবর ছোটু জানতো না। জানবেই বা কেমন করে'? ভিখারিণীর ছেলেকে কে নিমন্ত্রণ করবে?

ছোটুদের বাড়ী থেকে জমিদার বাবুদের বাড়ী অনেকটা পথ। ছোটু চলেছে তো চলেইছে, আর মনে মনে ভাবছে—

জমিদার বাবুদের কাছে সে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্‌বে,—ছোটুর মায়ের অবস্থার কথা শুনলে তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য করবেন,—এমন কি কিছু ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থাও করে' দিতে পারেন।

কয়দিনের উপোসী ছোটু তার দুর্ব্বল শীর্ণ পা টেনে টেনে চলেছে,—মনটা তার আশার আলোতে উজ্জ্বল।

পথের দুই ধারে ধানের ক্ষেত, তারই মাঝে মাঝে কাশ-ফুলের ঝাড়—হাওয়ায় হেল্‌ছে দুল্‌ছে। টল্‌টলে পুকুরগুলিতে কেমন শালুক ফুল ফুটে আছে। এই শালুক ফুলের নাল দিয়ে তরকারী হয়। ছোটুর মা একবার তাকে রেঁধে খাইয়েছিল,—ওঃ, খেতে সে কি চমৎকার! ছোটু ভাবল, বাড়ী যাবার পথে সে কিছু শালুক ফুল তুলে নিয়ে যাবে।

সাম্‌নে প্রকাণ্ড তালপুকুর, তারপরেই জমিদার-বাড়ী। তৃষ্ণায় ছোটুর ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। একটু জল না খেলে ছোটু আর হাঁট্‌তে পারে না! দুপুর বেলার রোদে তার মাথা তেতে উঠেছিল।

ছোটু আঁজলা ভরে' জল খেয়ে শান্-বাঁধানো সিঁড়ির উপর

ভিখারিণীর ছেলে

একটু বস্‌ল! পা দুটো তার ধরে' গেছিল। একটু না জিরিয়ে আর পারে না।

—বাঃ রে ওটা কি? সিঁড়ির একপাশে কি একটা জিনিষ চক্‌-চক্‌ করছে!

কাছে গিয়ে ছোটু দেখলো একটা ছোট চুড়ি।

ছোটু কোনো দিনও সোনা দেখে নাই, বুঝ্‌তে পারলে না চুড়িটা কোন্‌ জিনিষের তৈরী বাড়ী গিয়ে মাকে দেখাবে বলে' ছোটু চুড়িটা তার কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিল

হাসি-কান্না

জমিদার বাবু সত্যিই দয়ালু লোক। সমস্ত শুনে বল্‌লেন, "কালকে আসিস্, এখানে কালকে কাঙ্গালী ভোজন করানো হবে।" তারপর নায়েবকে ডেকে হুকুম দিলেন,—"ছোক্‌রা অনেক দূর থেকে এসেছে, আজকে ওকে কিছু খাবার ব্যবস্থা করে' দাও, আর কবিরাজ মশাইকে খবর দাও—যেন কাল ভোরেই তিনি রোগিণীকে দেখে এসে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করেন।"

ছোটু জীবনে এত আনন্দ কোন দিন আর পায় নাই। এত রকম খাবার সে জন্মে কোন দিন দেখে নাই। ছোটু একটার পর একটা খেয়ে চলেছে, কোন দিকে তার হুঁশ নাই। খাবার আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছিল।

হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে ছোটু চম্‌কে উঠল। একদল লোক ছোটুর দিকে আস্‌ছে, সকলের আগে আস্‌ছে বামুন ঠাকুর—যে ছোটুকে পরিবেশন করছিল।

কাছে এসে বামুন ছোটুকে দেখিয়ে বল্‌লে, "এই চোর,—ঐ যে কাপড়ের খুঁটে খুকুমণির চুরি-যাওয়া সোনার চুড়িটা।"

ভিখারিণীর ছেলে

ব্যস্, আর কথাবার্ত্তা নেই। চটাপট্ চটাপট্ চাঁটি আর চড় পড়তে লাগ্‌লো ছোটুর মাথায়, পিঠে।

ছোটু ব্যাপারটা ভালো করে' বুঝতে না বুঝতে তাকে সবাই মিলে হিড়্ হিড়্ করে' টেনে নিয়ে চল্ল জমিদার বাবুর কাছে। ছোটুর এত সাধের খাওয়া ফেলে উঠতে হোল। তার এখনো পেট ভরে-নি।

জমিদার বাবু গম্ভীর গলায় বল্‌লেন, "তোকে ভালো মানুষ ভেবে উপকার করতে গেছিলাম, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুই চোর।"

জমিদারের অনেকদিনকার বিশ্বাসী হিন্দুস্থানী চাকর চুড়ামন বল্লে, "হামি খোঁখীকে পুকুরঘাটে বসিয়ে আস্নান করছিলাম—তখনই বদ্‌মাস্ এই কাম করেছে। হামি যেই জলে ডুব দিয়েছি—অমনি চুড়ি চুরি করিয়েছে, আস্নান সেরে দেখি একঠো চুড়ির পাত্তা নাই।"

ব্যস্, অকাট্য প্রমাণ! জমিদার বাবু বল্লেন, "আমার বাড়ীতে চোরের স্থান নাই, আমার চোখের সামনে থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে যা,—নইলে চৌকীদার ডেকে ধরিয়ে দেব।

আর ব্যাটা আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আস্‌বি তো জুতিয়ে

পিঠের ছাল তুলে দেব বলে' রাখ্‌ছি।"

এর উত্তরে ছোটু আর কি বলবে,—আর বল্লেই বা বিশ্বাস করবে কে?

জমিদার-বাড়ীর ঠাকুর, চাকর, ছেলের দল, সবাই মিলে তাকে 'চোর' 'চোর' বলে' ব্যতিব্যস্ত করে' তুল্ল। বাড়ীর মেয়েরা চোরের চেহারা দেখতে বেরিয়ে এলো।

ভিখারিণীর ছেলে

ছোটু যে জায়গাতে খেতে বসেছিল, একবার করুণ জলভরা চোখে তাকিয়ে দেখলো—একটা খেঁকী কুকুর তার পাত থেকে খাবার তুলে তুলে খাচ্ছে।

ছোটু আবার পথ চলতে লাগল।

চোখের জল

শিবুর বাপ নেই, মা নেই,—ছিল এক ঠাকুরমা। কিন্তু সেও যখন চিরবিদায় নিয়ে চলে' গেল, তখন শিবু দেখ্‌লে এই জন-বহুল প্রকাণ্ড পৃথিবীতে তার দাঁড়াবার মত আর এতটুকু ঠাঁই নাই।

বাপ-ঠাকুর্দ্দার যে ভিটেটুকু সে এতদিন আঁকড়ে পড়েছিল, ঠাকুরমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গাঁয়ের জমিদার সেটুকু নিল দখল করে'। তাঁর নাকি অনেক দিনের খাজনা বাকী, এতদিন দয়া করে' শিবুদের থাক্‌তে দেওয়া হয়েছিল।

শিবু ছেলেমানুষ, পৃথিবীর কোনো কিছুরই খোঁজ সে রাখে না,—জমিদারের হুকুম অমান্য করবে এতটা বুকের পাটা তার ছিল না।

ছোট্ট আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা যে ভিটেটুকুকে সে

নিজের বলে' দাবী করতে পারত—সেটাও তার পোড়া বরাতে সইল না।—

সেদিন ছিল বোধ হয় পূর্ণিমা সন্ধ্যার পরই দূরের বাঁশ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে ঢল্‌ঢলে চাঁদা-মামার হাসিভরা মুখখানা আকাশে উঁকি মেরেছে। শিবুদের কুটীরের উঠানে আলো-ছায়ার খেলা চলছিল। শিরীশ ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপূর। শিবু বারান্দায় বসে' দুই হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আজ তার ঠাকুরমা নেই,—তার চিহ্নমাত্র নেই,—তাকে পুড়িয়ে ছাই করে' ফেলা হয়েছে!

বারান্দার একপাশে ঠাকুরমার চরকাটা পড়ে' আছে। এমনি রাতে' কতদিন ঠাকুরমা চরকা কাট্‌তে কাট্‌তে শিবুকে বলেছে—তার ঠাকুর্দ্দার কথা, তার বাপের ছেলেবেলার কাহিনী,—তার নিজের বিয়ের গল্প—আরো কত কি!—

উঠানের ঐ তুলসী-গাছটা ঠাকুরমার নিজের হাতে পোঁতা। আজ আর তুলসী-তলায় প্রদীপ দেওয়া হয় নাই। কে দেবে?

কুটীরের চারিদিকে ঠাকুরমার স্মৃতি ছড়ানো। সে সব দেখে শিবুর আজ বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে!

জোরে কাঁদ্‌বে এমন শক্তিও তার নাই,—আহা, বেচারীর সারাদিন খাওয়া হয় নাই!

চরকায় সুতো কেটে আর বাগানের ফল বিক্রী করে' শিবুর ঠাকুরমা শিবুকে আজ এতবড় করে' তুলেছে,—তার বড় সাধ ছিল শিবুকে মানুষ করে', তবে সে চোখ বুজ্‌বে। বুড়ীর মনের সাধ মনেই রয়ে গেল। শিবুকে পথে বসিয়ে চিরজন্মের মত তাকে বিদায় নিতে হ'ল।

শিবু বারান্দায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল—এইমাত্র গাঁয়ের কয়েকজন এসে তাকে মুখের সান্ত্বনা দিয়েই বিদায় নিয়েছে। সে কোথায় যাবে,—কি খাবে,—একথা জিজ্ঞাসা করবার কারুর ফুরসৎ হয় নাই।

"শিবু বাড়ী আছ?"

হঠাৎ অচেনা গলা শুনে শিবু চমকে উঠ্‌লো। সান্ত্বনা দিতেই বোধ হয় কেউ এসে থাক্‌বে।

শিবু বল্লে—"কে ?"

"আমি তারাচরণ—চৌধুরী বাবুদের নায়েব।"

শিবুকে আর কোন রকম প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই সে সোজা বল্লে—

"জমিদার বাবুদের অনেকদিনের খাজনা বাকী,—হয় খাজনাটা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দাও,—না হয় কাল ভোরে কাক ডাকবার আগেই এই ভিটে ছেড়ে চলে' যাও,—জমিদার বাবুর কড়া হুকুম। কাল সকালে প্যায়দা-পাইক নিয়ে জমিদার বাবু নিজে দেখ্‌তে আসবেন তাঁর হুকুম তামিল হয়েছে কি না!"

জুতো মস্ মস্ করতে করতে নায়েব চলে' গেল।

শিবু একবার ভাব্‌লে ডাক ছেড়ে চীৎকার করে' কাঁদে,—কিন্তু খুব সাম্‌লে গেল! তার ঠাকুরমা গেছে—ভিটের মায়াও সে আর করে না।

আকাশের অনেকখানি উপরে চাঁদ উঠেছে। শিবু একবার ঐ চাঁদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লো,—বাঃ—ঐ চাঁদটাও তো সারা আকাশের মাঝে একলা,—সে তো কাঁদছে না! তবে সে কাঁদবে কেন? সেও কাঁদবে না।

ঠাকুরমার মুখে শিবু শুনেছিল এখান থেকে প্রায় চার

চোখের জল

ক্রোশ দূরে একটা গ্রাম আছে, সে গ্রামের নাম রূপ-গাঁ। সেই রূপ-গাঁয়ের মোড়ল বিষ্টু মাইতি সম্পর্কে শিবুর জ্যাঠামশাই হয়।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে যেন এক ঝলক্ আলোর রেখা দেখা গেল! শিবু ঠিক করলে জ্যাঠামশায়ের কাছেই সে যাবে—কাল ভোরের অপেক্ষায় সে থাকবে না—এখনই সে রূপ-গাঁর উদ্দেশে রওনা হবে। ভিটের মায়া যখন ত্যাগ করতেই হবে—তখন আর দেরী করে' ফল কি?

শিবু এইবার আর কান্না চেপে রাখতে পারল না—চির-দিনের মত ঠাকুরমাকে বিদায় দিয়েছে—এবার চিরদিনের মত বাড়ী ছেড়ে যেতে হচ্ছে। নিজের বাপ-মাকে তা'র ভালো মনে নাই। সে যখন খুব ছোট তখনই দু'জনে ফাঁকি দিয়ে চলে' গেছে। তাদের জন্যে শিবুর কোন দুঃখ নেই—কারণ, ঠাকুরমার কাছে তাদের সম্বন্ধে কেবল গল্প শোনা ছাড়া আর কিছুই শিবু জানে না।

যে আসনটায় বসে' ঠাকুরমা শিবপূজা করত সেই আসনের উপর আছড়ে পড়ে, শিবু হাউ হাউ করে' একবার কেঁদে

উঠলো,—তারপর উঠে নিজের ছেঁড়া জামা-কাপড় যা ছিল তা' পোঁটলায় এঁটে শিবু বেরিয়ে পড়লো রূপ-গাঁর দিকে।

বিষ্টু মাইতির বাড়ীতেই শিবু আছে। বিষ্টুর ছেলে নিতাই শিবুরই প্রায় সমবয়েসী। বখাটের একশেষ,—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হৈ হৈ করে' বাইরে ঘুরে বেড়ায়। পাখীর ছানা পাড়্তে, পুকুর থেকে মাছ সরাতে, পরের বাগানে ফল চুরি করতে তার মত ওস্তাদ ও ধড়িবাজ ছেলে আর দুটি ছিল না।

শিবুকে পেয়ে নিতাই যেন হাতে চাঁদ পেল! ভাব্‌ল, এবার তার এক জুড়িদার মিলেছে! কিন্তু শিবুর স্বভাব নিতাইয়ের ঠিক উল্‌টো। শান্ত, শিষ্ট, নেহাৎ নিরীহ ভালো মানুষ শিবু। জীবনে যার একমাত্র সম্বল চোখের জল, তার স্বভাবটা ঐ চোখের জলের মতই ঠাণ্ডা আর স্নিগ্ধ হয়।

নিতাই দেখ্‌ল, শিবু নিতাইয়ের সঙ্গে মিশে না! তাই নিতাই শিবুর উপর অত্যাচার আরম্ভ করল। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে করে' সে যা-তা' শিবুর সম্বন্ধে তার বাবার কাছে বল্‌তে আরম্ভ করল।

চোখের জল

বিষ্টু মাইতি ভয়ানক কড়া মেজাজের খিটখিটে লোক। শিবু যে তার বাড়ীতে এসে উঠেছে—সেটা তার প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিষ্টু মাইতির স্ত্রীর দয়াতেই শিবু এ বাড়ীতে স্থান পেয়েছে।

শিবুর দিনরাত কাজ করতে হয়। বিষ্টু মাইতি যে সব কাজ নিজে করত,—এখন শিবুরই সে সব কাজ করতে হয়।

গরুর বিচালী কাটা, গরুকে ঘাস খাওয়ানো,—বিষ্টুর ছোট ছেলেকে কোলে ক'রে' বেড়ানো, বাসন মাজা, বিষ্টুকে তামাক সেজে দেওয়া, তার গা হাত পা রগ্‌ড়ে দেওয়া—শিবুর আর কাজের শেষ নাই। তবু রাতদিন শোনা যায় —"ছোঁড়াটা বসে' বসে' ভাত গেলে, কাজের নামে অষ্টরম্ভা!"

শিবু সমস্তই সহ্য করে—তা' ছাড়া তার আর উপায় কি? নিতাইয়ের কোন কথা না শুন্‌লে নিতাইও তাকে লাগায় চড়চাপড়্ কীল ঘুঁসি।

শিবুর ঠাকুরমা শিখিয়েছিল বোবার শত্রু নাই,—তাই শিবু চুপ করে' থাকে।

হাসি-কান্না

নিতাই শিবুকে মন্ত্রণা দেয়, "চল, পাকড়াশীদের বাগানের গাছে কাঁঠাল পেকেছে—চুরি করে' আনি।"

শিবু গরীব হলেও চুরি করতে শেখেনি। সে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়, বলে—এখন আমার গোয়াল সাফ করতে হবে, —জ্যাঠামশাই না হলে রাগ করবেন।"

চোখ রাঙ্গিয়ে নিতাই বলে— "আচ্ছা দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি, —বসে' বসে' অন্ন ধ্বংস করা আর বেশী দিন চল্‌বে না। কত ধানে কত চাল, তোমায় তা দেখাচ্ছি বাছাধন!"

বিষ্টু মাইতি তার ঘরে শিবুকে এম্‌নি এম্‌নি স্থান দেয় নাই,—যেটুকু উপকার সে শিবুর করেছে তার হাজার গুণ উপকার শিবুর কাছ থেকে সে আদায় করে' তবে ছাড়ে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত শিবুর আর কাজের অন্ত নেই, —কিন্তু কি করবে সে? পোড়া পেটের জন্যে সবই সে নীরবে সহ্য করছে।

শিবুর জ্যাঠাইমা লোকটি সাদাসিধে ভালো মানুষ। মনের মধ্যে অতটা ঘোর প্যাঁচ নেই,—যে যা বুঝিয়ে যায়, তাই বোঝে।

চোখের জল

নিতাই তার মাকে গোপনে ডেকে বলে, "মা, শিবুটা কিন্তু ছ্যাঁচ্‌ড়া চোর,—খুব সাবধান !"

সত্যি একদিন বিষ্টু মাইতির পকেট থেকে আট আনা পয়সা চুরি গেল। শিবু তখন মাঠে গেছে গরু চরাতে।

বিষ্টু মাইতি চীৎকার করে' হাঁক দিল—"পকেট থেকে পয়সা নিয়েছে কে ?"

নিতাই চুপে চুপে তার মাকে বল্লে, "শিবুরই এই কাজ আমি তাকে অনেকদিন পকেট হাতড়াতে দেখেছি।"

নিতাই একছুটে শিবুর ঘরে গেল। ঢেঁকি ঘরের একপাশে শিবুর থাকবার আস্তানা। সেখানে তার পোঁটলা খুলে নিতাই সত্যিই বের করলো একটা আট আনি।

ব্যস্ আর যায় কোথায় ?—গর্জ্জন করে' বিষ্টু মাইতি লাফিয়ে উঠ্‌ল—"অমুক ব্যাটার ছেলে শিবু,—ব্যাটাকে জুতিয়ে লাশ করব। যে দিল দুধ-কলা খেতে, তার ঘাড়েই ছোবল্ !"

নিতাই মনে মনে সন্তুষ্টই হলো,—এতদিন পরে সে শিবুকে আচ্ছা জব্দ করেছে। আট আনা পয়সা

সে-ই তার বাপের পকেট থেকে সরিয়ে শিবুকে চোর বানিয়েছে।

সারাদিন শিবুর খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যাবেলা সে গরু নিয়ে বাড়ী ফিরল। তার পেট তখন চোঁ-চোঁ করছে। সে জানে, তার ভাগ্যে ভাত আর ফ্যান্ ছাড়া আর কিছুই জুটবে না,—তবুও সেটাই তার কাছে অমৃত। ভাতের সঙ্গে ফ্যান্ মেখে—কয়েকটা লেবুপাতা চট্‌কে সে এক্ষুণি গিয়ে হাপুস্ হুপুস্ করে' খাবে। ওঃ, কি আনন্দ!

শিবু বাড়ী ফিরতেই নিতাই দৌড়ে গিয়ে তার বাপকে খবর দিল। বিষ্টু মাইতি একটা মাচিয়ার উপর বসে' কিসের জানি একটা হিসাব লিখ্‌ছিল।

শিবু ফিরেছে এই খবর পেতেই রাগে তার মাথাটা আগুন হয়ে উঠ্‌ল। গম্ভীর গলায় নিতাইকে বল্লে—"এখানে শিবুকে পাঠিয়ে দে এক্ষুণি!"

শিবু কিছুই জানে না। ক্ষিদের চোটে তার নাড়ী-ভুঁড়ি হজম হওয়ার যোগাড়। সে ধীরে ধীরে বিষ্টু মাইতির কাছে এসে দাঁড়াল।

চোখের জল

বিষ্টু মাইতি শিবুর কাণ দুটি ধরে' হিড়্ হিড়্ করে' তাকে খিড়কী দুয়ার পার করে' দিয়ে বল্লে—"সাম্‌নে সোজা পথ পড়ে'

আছে,—যেখানে ইচ্ছা চলে যা। ব্যাটার অনেক ভাগ্যি যে পুলিশে খবর দিই নাই।"

শিবু কি দোষ করেছে বুঝ্‌তে পারলো না—শুধু এ জান্‌লো এ বাড়ীতে আর তার স্থান নাই।

মেঠো পথের দু'ধারে ঘন আশ্‌শ্যাওড়ার ঝাড়ে ঝাড়ে থম্‌থমে অন্ধকার নেমে এলো, আর সেই সঙ্গে নেমে এলো শিবুর চোখে একরাশ জল। শিবু ভাবলো, এই বিপুল পৃথিবীর মাঝে এই চোখের জলই বুঝি তার একমাত্র সম্বল!

শিবু সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সমাপ্ত